# ভূমিকা

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' অর্থাৎ শিবই সত্য, শিবই সুন্দর এবং শিবই মঙ্গল। মানব সভ্যতার প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের বিবর্তনের প্রায় প্রতিটি স্তরে একজন পুরুষ দেবতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তিনি হলেন 'শিব'। কখনো তিনি মূর্তি রূপে আবার কখনো তিনি লিঙ্গরূপে পূজিত হয়ে আসছেন। মানব সভ্যতার বিকাশের ধারায় দেখা যায়, আনুমানিক ৪০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে পশু থেকে ধীরে ধীরে অর্থাৎ 'এপ' থেকে মানুষের মতো, তবে পুরোপুরি মানুষ নয়, এরূপ প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল। এরা 'অষ্ট্রালোপিথেকাস' নামে পরিচিত। এরপর ধীরে ধীরে 'হোমোহাবিলিস' অর্থাৎ দক্ষ মানুষের আর্বিভাব হয় আনুমানিক ২৬ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ বছর আগে। যদিও এরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা মানুষ অর্থাৎ 'হোমো ইরেকটাস' মানুষের আবির্ভাব ঘটে আজ থেকে আনুমানিক ২০ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বছর আগে। তবে আজকের বুদ্ধিমান মানুষ অর্থাৎ 'হোমো স্যাপিয়েন্স'-এর আবির্ভাব ঘটে আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগে। এই সময় মানুষ পাথরের হাতিয়ার বানাত এবং আগুনের ব্যবহারও শিখেছিল। পাথরের হাতিয়ার বানানো ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে সময়ের আরও তিনটি যুগবিভাগ করা হয়ে থাকে— পুরানো প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্যপ্রস্তর যুগ। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২০ লক্ষ বছর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত যে সময়কাল তাকে পুরানো প্রস্তর যুগ বলা হয়। মধ্য প্রস্তর যুগ-এর সময়কাল হল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১০ হাজার বছর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৮ হাজার বছর এবং নব্যপ্রস্তর যুগ— খ্রীষ্টপূর্ব ৮ হাজার থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৪ হাজার বছর। এই সময়ে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থাৎ ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, দাবানল, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত ছিল না; তারা মনে করত— কোনো অদৃশ্য শক্তির ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে এই সকল বিপর্যয় ঘটছে। তাই এই সকল বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে এক-একজন দেবতার কল্পনা করেছিল। অগ্নি, বরুণ, পবন প্রভৃতি দেবতার উদ্ভব এই ভাবেই হয়েছিল।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও মধ্য প্রস্তর যুগে মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করত। কিন্তু নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভব হওয়ায় মানুষ যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করল, অর্থাৎ সামাজিক জীবন যাপন শুরু করল। কৃষিকাজ প্রথম মেয়েরাই শুরু করেছিল। কারণ পুরুষেরা ফলমূল সংগ্রহ করার জন্য বাইরে ঘুরে বেড়াত। মেয়েরা ঘরে থাকত, ফল খেয়ে মাটিতে ফেললে একসময় তার থেকে চারাগাছ জন্মায়— এই বিষয়টি মেয়েরাই প্রথম লক্ষ্য করেছিল। তাই তারা একটি 'কর্ষণ যষ্টি' বানিয়ে, তা দিয়ে ভূমি কর্ষণ করে সেখানে বীজ ছড়িয়ে প্রথম শস্য উৎপাদন করল। 'ভূমি'-কে বরাবরই মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়, আর 'কর্ষণ যষ্টি' বা 'লাঙ্গল'-কে পুরুষ রূপে কল্পনা করে

মানুষ কৃষিকাজে নারী-পুরুষের আদিমতম সম্পর্ককে চাষের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। তাই সেই সময়ের মানুষ কৃষিকাজকে লিঙ্গপূজা বা ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা রূপেই কল্পনা করেছে। নব্যপ্রস্তর যুগে এইভাবেই লিঙ্গপূজার প্রবর্তন হয়, এই লিঙ্গপূজা থেকেই পরবর্তী সময়ে শিব ও শক্তির পূজার প্রচলন হয়। এখানে শক্তি বলতে ভূমি বা নারীকে বোঝানো হচ্ছে, আর শিব হলেন আদি কৃষক।

নব্যপ্রস্তর যুগের পরে এসেছে তাম্র-প্রস্তর যুগ। এই যুগের অন্তর্গত সিন্ধু-সভ্যতা অর্থাৎ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতায় শিব ও শক্তি পূজার প্রচলন ছিল। সেই সভ্যতার মানুষেরা একজন পুরুষ দেবতার পূজা করতেন। মহেঞ্জোদারো থেকে একটি তিনমুখ বিশিষ্ট পুরুষ দেবতার মূর্তি পাওয়া যায়— ''একটি চতুষ্কোণ বেদীতে যোগাসনে মূর্তিটি উপবিষ্ট— ত্র্যম্বক জটাধারী উলঙ্গ ঊর্ধ্বমেঢ্র; একটি হস্ত জানুতে, কটিতে কোমর-বন্ধনী, হস্তে-বক্ষে আবরণী, মস্তকে যুগ্ম শৃঙ্গ; আসনের নীচে হরিণ, চারিদিকে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ ও ব্যাঘ্র।''[১] এখানেই আদি শিবের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। এই শিব পশুদের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক— পশুপতি। তিনি ত্রিনয়ন বিশিষ্ট যোগীশ্বর। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি শীলমোহরে এই রকম ধ্যানী, পশু ও সাপ পরিবেষ্টিত পুরুষ দেবতার মূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া হরপ্পা নগরে পোড়া মাটির তৈরী একটি শীলমোহরে যোগাসনে বসা একজন পুরুষ দেবতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়— যাঁর মাথায় দীর্ঘ শিরোভূষণ, নানারকম প্রাণী তাঁকে পরিবেষ্টন করে আছে, শীলটির অপর দিকে আছে একটি বৃষ মূর্তি ও ত্রিশূলধ্বজ। এটিও আদি শিবের মূর্তি বলে মনে করা হয়।

বৈদিক যুগে শিবের রুদ্ররূপ কল্পনা করা হয়েছে। ঋক্‌বেদের রুদ্র যজুর্বেদে এসে মঙ্গলময় দেবতা অর্থাৎ রুদ্ররূপ ও যোগীরূপের মধ্যে একপ্রকার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন— ''ভারতীয় পৌরাণিক সমাজ রুদ্র, শিব ও যোগী চরিত্রের মধ্যে কোনো প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সেই জন্য একদিকে যেমন ঘোর, ভৈরব এবং রুদ্র, আবার তেমনি অন্যদিকে অঘোর, শিব এবং দক্ষিণ— আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্দ্র।''[২]

প্রথমদিকে শিব ছিলেন রুদ্ররূপী। তিনি শ্মশানবাসী, ভূত-প্রেত তাঁর নিত্যসঙ্গী। নেশাভাঙ করে তিনি ভয়ানক কাণ্ড ঘটান। অনার্য রক্তের কঠিন, কঠোর ও অশিষ্ট রূপটি শিবের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আর্যদের হাতে পড়ে শিবের চারিত্রিক রূপান্তর ঘটে। তথাপি শিব অনার্য দেবতা, কেউ কেউ মনে করেন শিব লিঙ্গ পূজক দ্রাবিড়দের দেবতা। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, কৈলাস থেকে কিন্নর জাতির এই দেবতাকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে যেভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজে শিবের অনুপ্রবেশ ঘটুক না কেন কালক্রমে আর্য ও অনার্য উভয়েই শিবকে দেবতারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তবে— ''আর্যদের সমাজে এই অদ্ভুতচারী দেবতা বলপূর্বক প্রবেশ করিলেন

বটে, কিন্তু ইহাকে অনেক জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল। .... যে দেবতা স্বর্গবিহারী নহেন, ভস্ম নৃমুণ্ড রুধিরাক্ত হস্তিচর্ম যাঁহার সাজ, তাঁহার নিকট হইতে কোনো, কৈফিয়ত না লইয়া তাঁহাকে দেবসভায় স্থান দেওয়া যায় না।''[৩] তবে সমাজে উচ্চশ্রেণীর আর্যদের মধ্যে শিবের শান্ত সৌম্য মহিমময় রূপটি পূজিত হলেও, অনার্য সমাজে তাঁর সেই অসংযমী অশিষ্ট ভাবটিই রয়ে যায়। প্রাগার্য যুগেও বাংলাদেশে শৈবধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু আর্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশের পর আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনের ফলে শিবের স্বরূপেরও এক-প্রকার সামঞ্জস্য গড়ে ওঠে। তবে বর্তমানে শিবের যে মূর্তি বা রূপ দেখা যায় তা পৌরাণিক যুগেই উদ্ভুত। বর্তমানে শিবের লিঙ্গ পূজা এতটাই জনপ্রিয় যে, তাঁর মূর্তি পূজা ক্রমশঃ ম্রীয়মান হয়ে পড়েছে।

নব্যপ্রস্তর যুগ কিংবা তাম্র প্রস্তর যুগ— সে সময়ের কোনো লিখিত সাহিত্য না থাকায় শিব সম্পর্কে সে সময়ের কোনো মুদ্রিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র কিছু প্রত্নতাত্বিক উপাদানের সাহায্যেই শিব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যাই হোক, আমার অন্বেষণের বিষয় প্রাক্ আধুনিক পর্বে বাংলা সাহিত্যে শিব চরিত্রের বিবর্তন। ঠিক কোন্ সময়কে বাংলা সাহিত্যের প্রাক্ আধুনিক পর্ব বলা হয় তা সর্বাগ্রে আলোচনার দাবী রাখে। বাংলা সাহিত্যের সময়কালকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগ— ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের একমাত্র লিখিত নিদর্শন হল 'চর্যাপদ'। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। যদিও মধ্যযুগের প্রথম দেড়শো বছর লিখিত কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিভিন্ন শাখা পল্লবিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে জীবনী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিদের রচিত কাব্য, বিভিন্ন অনুবাদ সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ (১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ), ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী সময় অর্থাৎ মধ্যযুগ 'প্রাক্ আধুনিক যুগ' নামে পরিচিত। আমার গবেষণার বিষয় 'বিবর্তনের ধারায় প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিব চরিত্র'। প্রাক্ আধুনিক পর্বের যে সাহিত্য, তন্মধ্যে শিব চরিত্রকে অন্বেষণ করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিদের রচিত কাব্য এবং চৈতন্য-জীবনী কাব্য-এর মধ্যে শিব চরিত্রের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু প্রধান বাংলা অনুবাদ কাব্যগুলি অর্থাৎ কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এবং মালাধর বসুর সংস্কৃত ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য— এই তিনটি অনুবাদ কাব্যমধ্যে শিব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নাথ সাহিত্যে শিব আছেন নাথ ধর্মের 'আদিনাথ' বা 'আদিগুরু' হিসেবে। শাক্ত পদাবলীতে শিব 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গানে উমা বা গৌরীর স্বামীরূপে উপস্থিত হয়েছেন। মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্য শাখা

হল— মঙ্গলকাব্য। একমাত্র ধর্মমঙ্গল কাব্য ব্যতিরেকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্য, যেমন— মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডে শিবের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য তো পুরোপুরি শিবকেন্দ্রিক, এবং অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবী অন্নদার স্বামী শিব মূল কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মধ্যযুগের এই সকল বাংলা সাহিত্যে আমরা শিবের যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি, তা শিবের বিবর্তিত রূপ। এই সময়কালের পূর্ববর্তী সময়ে রচিত বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যেও শিব চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে শিব চরিত্রের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে, তারই আলোকে প্রাক্ আধুনিক পর্বের শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হয়েছে। তাই প্রাক্ আধুনিক পর্বের শিব চরিত্রের বিবর্তনকে স্পষ্টরূপে গবেষণা অভিসন্দর্ভে ফুটিয়ে তোলার জন্য নির্বাচিত সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতে, অর্থাৎ 'বেদ' (ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব), 'উপনিষদ', বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ', কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'মহাভারত' ও 'ভাগবত', কালিদাসের নির্বাচিত কাব্য 'কুমারসম্ভবম্' ও 'রঘুবংশম্' কাব্যে এবং 'শিবপুরাণ' ও অন্যান্য পুরাণ সমূহে শিব চরিত্র কী কী বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত তা অন্বেষণ আমার গবেষণার বিষয়।

'বিবর্তনের ধারায় প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিব চরিত্র' বিষয়ে গবেষণামূলক কাজটি করতে গিয়ে শিব চরিত্রের বিবর্তন বিষয়টিকে পরিস্ফুট করার জন্য চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। অধ্যায় বিভাজন নিম্নরূপ—

**প্রথম অধ্যায় :** বাংলা সাহিত্য-পূর্ববর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যে শিব চরিত্রের স্বরূপ

**দ্বিতীয় অধ্যায় :** প্রাক্ আধুনিক যুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে শিব চরিত্রের স্বরূপ

**তৃতীয় অধ্যায় :** প্রাক্ আধুনিক যুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে শিব চরিত্রের স্বরূপ

**চতুর্থ অধ্যায় :** প্রাক্ আধুনিক যুগের অপ্রধান বাংলা সাহিত্যধারায় শিব চরিত্রের স্বরূপ

প্রথম অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্য পূর্ববর্তী নির্বাচিত যে সংস্কৃত সাহিত্যগুলিকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি, তা হল— 'বেদ', 'উপনিষদ', মহামুনি বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ', ব্যাসদেব রচিত 'মহাভারত', ও 'ভাগবত', মহাকবি কালিদাস রচিত 'কুমারসম্ভবম্' ও 'রঘুবংশম্' এবং 'শিবপুরাণ' সহ আঠারোটি পুরাণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্যযুগের সাহিত্যের নির্বাচিত অনুবাদ কাব্য কৃত্তিবাস ওঝা অনূদিত 'শ্রীরাম পাঁচালী', কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত' এবং মালাধর বসুর অনুবাদ কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাচিত বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিকে আলোচনা করে প্রাক্ আধুনিক পর্বে শিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোচনা করে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি থেকে শিব চরিত্র কোথায় পৃথক বৈশিষ্ট্য বহন করছে, তা বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে। যে সকল মঙ্গলকাব্যগুলিকে আমি আলোচনার জন্য

গ্রহণ করেছি, তা হল— বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসা-বিজয়', নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ', বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ' জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল', কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল', মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল', মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত', রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন', রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন', রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। সর্বশেষ অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের অপ্রধান সাহিত্যধারায় শিবের অবস্থান বিষয়ে অন্বেষণের প্রয়াস রয়েছে। এই অধ্যায়ে 'নাথ সাহিত্য' ও 'শাক্তপদাবলী'-কে আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি। 'বেদ' থেকে শুরু করে 'শাক্তপদাবলী' পর্যন্ত শিব চরিত্রের কী কী পরিবর্তন হয়েছে এবং বৈদিক যুগ থেকে প্রাক্ আধুনিক পর্ব পর্যন্ত শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে স্পষ্ট করার এবং শিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহকে অন্বেষণ করাই হল আমার গবেষণার বিষয়।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে, যেমন আর্য সভ্যতা অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতা, প্রাক্ বৈদিক সভ্যতা অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা এবং তারও আগে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতায় অর্থাৎ নব্যপ্রস্তর যুগ ও তাম্র-প্রস্তর যুগে শিবের অস্তিত্ব ছিল। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছেন বর্তমান দেবদিদেব মহাদেব। ভারতীয় সভ্যতা যেমন আর্য ও অনার্য এই দুই ধারার সম্মিলিত রূপ, তেমনি আর্য ও অনার্য উভয় ধারায় শিবের যে রূপ তারই সম্মিলিত রূপ পৌরাণিক শিব চরিত্র। প্রাগার্য যুগের ভগবান শিব বৈদিক যুগে রুদ্ররূপ ধারণ করেছেন। কিন্তু যজুর্বেদে রুদ্রদেব 'শিব'-এ পরিণত হয়েছেন, সেখানে তিনি পরমাত্মা। বেদ পরবর্তী পৌরাণিক যুগে এসে শিব হয়েছেন ভক্তের ভগবান। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের শিব প্রাক্ আধুনিক পর্বে এসে লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আদর্শও লৌকিক শৈব ধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়। কালক্রমে আর্য, অনার্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকল ধর্মমত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাংলার লৌকিক শৈবধর্ম অভিনব রূপ ধারণ করে। লৌকিক শিবের চরিত্রে পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য আছে ঠিকই, কিন্তু সে সবও লৌকিক ভাবের আধারে। দেবদেবীদের মধ্যে শিবকেই সর্বপ্রথম বাংলার লৌকিক ধর্মমতগুলির প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসতে হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের নির্বাচিত কাব্যগুলির আলোচনার মধ্য দিয়ে সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাক্ আধুনিক পর্ব পর্যন্ত শিব চরিত্রের বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক স্বরূপের আলোচনা করে শিব চরিত্রের বিবর্তনের বিষয়টিকে পরিস্ফুট করার প্রয়াস রইল। শিব চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অন্বেষণই আমার গবেষণার মূল বিষয়। প্রাক্ আধুনিক পর্বের শিব চরিত্রের বিবর্তনের বিষয়টিকে পরিপূর্ণতা দান করার লক্ষ্যে, প্রাক্ আধুনিক পর্বের পূর্ববর্তী সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতে শিব চরিত্রের অনুসন্ধান করে তার আলোকে প্রাক্ আধুনিক পর্বের শিব চরিত্রের বিবর্তনকে তুলে ধরার আন্তরিক প্রচেষ্টা রইল। আমার গবেষণা, অনুসন্ধান ও অন্বেষণের মধ্য দিয়ে প্রাগার্য যুগ

থেকে প্রাক্ আধুনিক পর্ব পর্যন্ত শিব চরিত্রের বিবর্তনকে তুলে ধরার জন্য পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে নির্বাচিত কাব্যগুলিকে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলাম।

**তথ্যসূচী :**


১. বাংলা কাব্যে শিব - গুরুদাস ভট্টাচার্য, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭, প্রথম সংস্করণ ৭ই আশ্বিন, ১৮৮২, পৃষ্ঠা - ১৭

২. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস - শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, , এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২,বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা - ৭৩, পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ - বইমেলা - ১৯৯৮, দশম পুনর্মুদ্রণ - এপ্রিল - ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৮৩ -৮৪

৩. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য - দীনেশচন্দ্র সেন, সম্পাদনা - নিমাইচন্দ্র পাল, সারস্বতকুঞ্জ, ১১বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯, সারস্বতকুঞ্জ সংস্করণ - ২০০৯, পরিশিষ্ট - ক, রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধ ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, পৃষ্ঠা - ৫০৩